নবীন

BANGLADARSHAN.COM

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥নবীন॥

॥প্রথম পর্ব॥

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিকপ্রান্তে, বনপ্রান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে,
সরোবরতীরে, নদীতীরে,
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী।
নগরে গ্রামে কাননে,
দিনে নিশীথে,
পিকসংগীতে নৃত্যগীতকলনে
বিশ্ব আনন্দিত–
ভবনে ভবনে
বীণাতান রণ-রণ ঝংকৃত।
মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে
নবপ্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা
ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে॥

BANGLADARSHAN.COM

শুনেছ অলিমালা, ওরা ধিক্কার দিচ্ছে ঐ ও পাড়ার মল্লের দল; তোমাদের চাপল্য তাদের ভালো লাগছে না। শৈবালগুচ্ছবিলম্বী ভারী ভারী সব কালো কালো পাথরগুলোর মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্যে ওরা গুহাদ্বারে ভ্রূকুটি পুঞ্জিত করে বসে আছে। কলহাস্যচঞ্চলা নির্ঝরিণী ওদের নিষেধ লঙ্ঘন করেই বেরিয়ে পড়ুক এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে; চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গের অঞ্জলিবিক্ষেপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শৌর্যের অনুপ্রেরণা আছে সেটা ও পাড়ার শাস্ত্রবচনের বেড়া এড়িয়ে চলে গেল। ভয় কোনো না তোমরা, যে রসরাজের নিমন্ত্রণে এসেছ তাঁর প্রসন্নতা যেমন আজ নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে ঐ অন্তঃস্মিত গন্ধরাজমুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে, তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধনটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁরই চরণে তোমাদের নৃত্যের নৈবেদ্য নির্ঝরিত করে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা–
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা।
মন্দাকিনীর ধারা
উষার শুকতারা,
কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা।
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা।

তুমি সুন্দর যৌবনঘন,
রসময় তব মূর্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব
অপচয়পরিপূর্তি।
নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ
কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ
মরণহীন চিরনবীন
তব মহিমাস্ফূর্তি।

BANGLADARSHAN.COM

ও দিকে আধুনিক আমলের বারোয়ারির দল বলছে, উৎসবে নতুন কিছু চাই। কোণাকাটা ত্যাড়াবাঁকা দুম্দাম-করা কড়া-ফ্যাশানের আহেলা বেলাতি নতুনকে না হলে তাদের শুকনো মেজাজে জোর পৌঁচচ্ছে না। কিন্তু, যাঁদের রসবেদনা আছে তাঁরা কানে কানে বলে গেলেন, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। এঁরা বলেন, মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খোঁচা মেরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নিঃসংকোচে বারে বারে রঙিন। চিরপুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, ‘লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল! সেই নিত্যনন্দিত সহজশোভন নবীনের উদ্দেশে তোমাদের আত্মনিবেদনের গান শুরু করে দাও।

আন্ গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে–
এই সুসময় ফুরায় পাছে।
কুঞ্জবনের অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,

বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে।

প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে,
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস–‘পরে।
দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায়, ‘জাগো জাগো’,
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
রক্তরঙের জাগল প্রলাপ অশোক গাছে॥

আজ বরবর্ণিনী অশোকমঞ্জরী তার চেলাঞ্চল-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে রক্তরঙের কিঙ্কিণীঝংকার বিকীর্ণ করে দিলে; কুঞ্জবনের শিরীষবীথিকায় আজ সৌরভের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য। ললিতিকা, আমরাও তো শূন্য হাতে আসি নি। মাধুর্যের অতল সমুদ্রে আজ দানের জোয়ার লেগেছে, আমরাও ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই তরীর রশি খসিয়ে দিয়েছি। যে নাচের তরঙ্গে তারা ভেসে পড়ল সেই নাচের ছন্দটা, কিশোর, দেখিয়া দাও।

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি-যে দান
আমার, আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ।
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্যে রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান।

পূর্ণিমাসন্ধ্যায়
তোমার রজনীগন্ধায়
রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধচোখের রঙিন স্বপন-মাখা–
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখসুখের সকল অবসান॥

ভরে দাও, একেবারে ভরে দাও গো, ‘প্যালা ভর ভর লায়ী রে।’ পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া, একেবারে একই কথা। ঝর্ণার এক প্রান্তে কেবলই পাওয়া অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে কেবলই দেওয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রের দিকপানে। এই ধারার মাঝখানে শেষে বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন এই বিশ্ব। আমাদের গানেও সেই আবৃত্তি, কেননা, গান তো আমরা শুধু কেবল গাই নে, গান-যে আমরা দিই, তাই গান আমরা পাই।

BANGLADARSHAN.COM

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে–
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে।
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা গাইবি ব'লে।
কমলবরণ গগনমাঝে
কমলচরণ ওই বিরাজে।
ওইখানে তোর সুর ভেসে যাক,
নবীনপ্রাণের ওই দেশে যাক,
ওই যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে॥

মধুরিমা, দেখো দেখো, চন্দ্রমা তিথির পর তিথি পেরিয়ে আজ তার উৎসবের তরণী পূর্ণিমার ঘাটে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। নন্দনবন থেকে কোমল আলোর শুভ্র সুকুমার পারিজাতস্তবকে তার ডালি ভরে আনল। সেই ডালিখানিকে ঐ কোলে নিয়ে বসে আছে কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা। রাজহংসের ডানার মতো তার লঘু মেঘের শুভ্র বসনাঞ্চল স্রস্ত হয়ে পড়েছে ঐ আকাশে, আর তার বীণার রুপোর তন্তুগুলিতে অলস অঙ্গুলিক্ষেপে থেকে থেকে গুঞ্জরিত হচ্ছে বেহাগের তান।

BANGLADARSHAN.COM

নিবিড় অমা-তিমির হতে
বাহির হল জোয়ারস্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে,
সাজালো ডালা অমরাকূলে
আলোর মালা চামেলিবরনী
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।

তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে
পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী॥

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। এক প্রান্তে মিলন আর-এক প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ করে করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে জীবন থেকে মরণে, বাহির থেকে অন্তরে। এই ছন্দটি বাঁচিয়ে যে চলতে চায় সে তো যাওয়া-আসার দ্বার খোলা রেখে দেয়। কিন্তু, ঐ-যে হিসাবি মানুষটা দ্বারে শিকল দিয়ে আঁক পাড়ছে তার শিকল-নাড়া দাও তোমরা। ঘরের লোককে অন্তত আজ একদিনের মতো ঘরছাড়া করো।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্,
লাগল-যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে
লাগল-যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল্।

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
খোল্ দ্বার খোল্।

বেনুবন মর্মরে দখিনবাতাসে
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে–
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
খোল্ দ্বার খোল্।

আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

সর্বনাশের ব্রত যাদের তাদের ভয় ভাঙিয়ে দাও। কারও কারও যে দ্বিধা ঘোচে না। ঐ দেখো-না পাতার আড়ালে মাধবী। ঐ অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। শুনছ না বকুলগুলো ঝরতে ঝরতে বলছে ‘যা হয় তা হোক গে’, আমের মুকুল বলে উঠছে ‘কিছু হাতে রাখব না।’ যারা কৃপণতা করবে তাদের সময় বয়ে যাবে।

BANGLADARSHAN.COM

হে মাধবী, দ্বিধা কেন—আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি।
বাতাসে লুকায়ে থেকে
কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে-যে গেছে লেখি।

কখন্ দখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি,
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া,
করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরী উঠে দূর হতে কারে দেখি॥

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্ত রাতে,
আমার ভাঙল যা তাই ধন্য হল চরণপাতে।
নন্দিনী, ঐ দেখে নাও শিশুর লীলা, ঐ-যে কচি কিশলয়—
শ্যামল কোমল চিকন রূপের নবীন শোভা—দেখে যা—
কল-উতরোল চঞ্চলদোল ওই-যে বোবা।

BANGLADARSHAN.COM

শিশু হয়ে এসেছে চিরনবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ঐ সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। সেই তো তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মুখরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে
নবপল্লবদল।
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো—
মর্মরতানে প্রাণে ওরা আনে
কৈশোরকোলাহল।
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে
নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,

চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা
শ্যামশিখা হোমানল॥

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পৌঁছিয়ে দিলে। কিন্তু, ভুলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়—তাই মনে হয়, ঘরের মধ্যে নিশ্চল হয়ে মিলন স্থায়ী হয় না, পথে বেরিয়ে পড়লে তবেই পথিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়ানো যায়। তাই আজ পথকেই প্রণাম।

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার
করুণ রঙিন পথ।
এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর
দুয়ারে লেগেছে রথ।
সে-যে সাগরপারের বাণী
মোর পরানে দিয়েছে আনি,
তার আঁখির তারায় যেন গান গায়
অরণ্য পর্বত।
দুঃখসুখের এপারে ওপারে
দোলায় আমার মন,
কেন অকারণ অশ্রুসলিলে
ভরে যায় দু'নয়ন।
ওগো নিদারুণ পথ, জানি,
জানি, পুন নিয়ে যাবে টানি
তারে, চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া
যাবে সে স্বপনবৎ॥

বাতাসের চলার পথে যে মুকুল পড়ে ঝরে,
তা নিয়ে তোমার লাগি রেখেছি ডালি ভরে।

টুকরো টুকরো সুখদুঃখের মালা গাঁথব—সাতনরী হার পরাব তোমাকে মাধুর্যের মুক্তোগুলি চুনে নিয়ে। ফাগুনের ভরা সাজির উদ্বৃত্ত থেকে তুলে নেব বনের মর্মর, বাণীর সূত্রে গেঁথে বেঁধে দেব তোমার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার দেওয়া ভূষণ প'রেই তুমি আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে তোমার দক্ষিণ হাতে।

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।

BANGLADARSHAN.COM

দিল তারে বনবীথি
কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে।
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে॥

॥দ্বিতীয় পর্ব॥

কেন ধরে রাখা, ও-যে যাবে চলে
মিলনলগন গত হলে।
স্বপনশেষে নয়ন মেলো,
নিবু নিবু দীপ নিবায়ে ফেলো,
কী হবে শুকানো ফুলদলে।

BANGLADARSHAN.COM

এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো শিরীষবনের পুষ্পাঞ্জলি উঠছে ভরে ভরে, তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। বিদায়দিনের প্রথম হাওয়া অশথগাছের পাতায় পাতায় ঝর ঝর করে উঠছে। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, দিগন্তে পথের একতারার সুর বাঁধা হচ্ছে–মনে হচ্ছে, যেন বসন্তী রঙ মলান হয়ে গেরুয়া রঙে নামল।

চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন।
অধীর সমীরভরে
উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,
গন্ধসনে হল মন সুদূরে বিলীন।
পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরই তাপে,
মধুকরগুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।
কেন জানি অকারণে

সারাবেলা আনমনে
পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন॥

বিদায় দিয়ো মোরে প্রসন্ন আলোকে,
রাতের কালো আঁধার যেন নামে না ওই চোখে।

হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটি মঞ্জুর হল। তার প্রণাম তুমি নাও। তার আপন গানের বন্ধনেই চিরদিন সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে। তার সুরের রাখী তুমি গ্রহণ করেছ আমি জানি; তার পরিচয় রইল তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শম্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক–
যায় যদি সে যাক।
রইল তাহার বাণী, রইল ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে–
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার
রইবে না নির্বাক্।
ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।
তারে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তার থাক্॥

তবে শেষ করে দাও শেষ গান,
তার পরে যাই চলে।
তুমি ভুলো না গো এ রজনী
আজ রজনী ভোর হলে।

এর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না। এ দিকে বসন্তের পালা সাঙ্গ হল। ত্বরা কর্ গো, ত্বরা কর্–বাতাস তপ্ত হয়ে এল, এইবেলা রিক্ত হবার আগে অঞ্জলি পূর্ণ করে দে–তার পরে আছে করুণ ধূলি তার আঁচল বিছিয়ে।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি বন্ধু,
বেঁধেছিনু অঞ্জলি।
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা
উঠিতেছে ছলছলি।

BANGLADARSHAN.COM

এখনো বনের গান
বন্ধু, হয় নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর করুণ বল্লিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হল, এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস বলি॥

‘শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে’ বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগুলি একদিন আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, আজ তারা যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিয়ে বললে, ‘তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর।’

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র
আমার হিয়াতলে।
ঝরা পাতা গো, বসন্তী রঙ দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ!
খেলিলে হোলি ধুলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ো রঙিন করি,
অস্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে॥

BANGLADARSHAN.COM

সে-যে কাছে এসে চলে গেল তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!

মন ছিল সুপ্ত, কিন্তু দ্বার ছিল খোলা, সেইখান দিয়ে কার নিঃশব্দ চরণের আনাগোনা। জেগে উঠে দেখি ভুঁইচাঁপা ফুলের ছিন্ন পাপড়ি লুটিয়ে আছে তার যাওয়ার পথে। আর দেখি, ললাটে পরিয়ে দিয়ে গেছে বরণমালা, তার শেষ দান, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন দিলে পরায়ে
স্বপনে বরণমালা, ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে

অরুণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রু-গালা।
গোপনে এসে গেলে
দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখডোরে
বাঁধিল মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা।

হে বনস্পতি শাল, অবসানের অবসাদকে তুমি দূর করে দিলে। তোমার অক্লান্ত মঞ্জরীর মধ্যে উৎসবের শেষবেলাকার ঐশ্বর্য, নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমি শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে ‘পুনর্দর্শনায়।’ তোমার আনন্দের সাহস বিচ্ছেদের সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়াল।

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল,
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,
সৌরভধনে তখন তুমি হে শাল,
বসন্তে করো ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিক্তবেলায় অঞ্চল যবে শূন্য–
বনসভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি,
সব অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

BANGLADARSHAN.COM

এইবার শেষ দেওয়া-নেওয়া চুকিয়ে দাও। দিয়ে দাও তোমার বাহিরের দান, উত্তরীয়ের সুগন্ধ, বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও আমার অন্তরের বেদনা নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও
মোর প্রাণে গোপনে গো।
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,
মর্মরমুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও
বেদনা হতে বেদনে–
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন,
যে বাণী নীরব নয়নে॥

দূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে গেল পথিক। এমনি করেই বারে বারে সে কাছের বন্ধন আল্গা করে দেয়। একটা অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ বলে দিয়ে যায় কানে কানে, সাহসের সুর এসে পৌঁছয় বিচ্ছেদসমুদ্রের পরপার থেকে—মন উদাস হয়ে যায়।

বাজে করুণ সুরে (হায় দূরে)
তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা।
মম পান্থচিত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশে।

যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে।

BANGLADARSHAN.COM

॥পরিশিষ্ট॥

প্রথম অভিনয়কালে ‘নবীন’ যে আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা এই পরিশিষ্টে সংকলিত হইল। যে গানগুলি প্রচলিত ‘নবীন’ গ্রন্থে বা অন্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে তাহাদের প্রথম ছত্রই কেবল দেওয়া গেল। ‘হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে’ গানের পাঠান্তর ‘হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে’ গানটি পুনর্মুদ্রিত হইল। ‘বেদনা কী ভাষায় রে’ প্রচলিত গ্রন্থে বর্জিত হইলেও, প্রথম প্রকাশিত নবীনের অন্তর্ভুক্ত নবরচিত গান হিসাবে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।

॥নবীন॥

॥প্রথম পর্ব॥

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী

শুনেছ অলিমালা, ওরা বড়ো ধিক্কার দিচ্ছে, ঐ ওপাড়ার মল্লের দল, উৎসবে তোমাদের চাপল্য ওদের ভালো লাগছে না। শৈবালপুঞ্জিত গুহাদ্বারে কালো কালো শিলাখণ্ডের মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্যে ওরা নিশ্চল হয়ে ভ্রূকুটি করছে, নির্ঝরিণী ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে কলহাস্যে—চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিকীর্ণ করে দিতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শৌর্যের অনুপ্রেরণা আছে, সেটা ওদের শাস্ত্রবচনের বেড়ার বাইরে দিয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা; যে রসরাজের নিমন্ত্রণে তোমরা এসেছ, তাঁর প্রসন্নতা যেমন নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে অন্তঃস্মিত গন্ধরাজমুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধ নটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁর চরণে তোমাদের নৃত্যের অর্ঘ্য নিবেদন করে দাও।

BANGLADARSHAN.COM

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা

একটা ফর্মাশ এসেছে বসন্ত-উৎসবে নতুন কিছু চাই—কিন্তু যাদের রসবেদনা আছে তারা বলছে, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। তারা বলে, মাধবী বছরে বছরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ পুরাতন রঙেই বারে বারে রঙিন। এই চিরপুরাতন ধরণী সেই চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, ‘লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।’ সেই নবীনের উদ্দেশে তোমাদের গান শুরু করে দাও।

আন্ গো তোরা কার কী আছে

অশোকবনের রঙমহলে আজ লাল রঙের তানে পঞ্চমরাগে সানাই বাজিয়ে দিলে, কুঞ্জবনের বীথিকায় আজ সৌরভের অবারিত দানসত্র। আমরাও তো শূন্যহাতে আসি নি। দানের জোয়ার যখন লাগে অতল জলে তখন ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাইতরী রশি খুলে দিয়ে ভেসে পড়ে। আমাদের ভরা নৌকো দখিন হাওয়ায় পাল তুলে সাগর-মুখো হল, সেই কথাটা কণ্ঠ খুলে জানিয়ে দাও।

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি-যে দান

ভরে দাও একেবারে ভরে দাও, কোথাও কিছু সংকোচ না থাকে। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া একই কথা। ঝর্নার এক প্রান্তে পাওয়া রয়েছে অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে দেওয়া রয়েছে অতলস্পর্শ সাগরের দিকে, এর মাঝখানে তো কোনো বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার আবর্তন নিয়ে এই বিশ্ব।

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে।

মধুরিমা, দেখো, দেখো, চাঁদের তরণীতে আজ পূর্ণতা পরিপুঞ্জিত। কত দিন ধরে এক তিথি থেকে আর-এক তিথিতে এগিয়ে এগিয়ে আসছে। নন্দনবন থেকে আলোর পারিজাত ভরে নিয়ে এল–কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা সেই ডালি কোলে নিয়ে বসে আছে; ক্ষণে ক্ষণে রাজহংসের ডানার মতো তার শুভ্র মেঘের বসনপ্রান্ত আকাশে এলিয়ে পড়ছে। আজ ঘুমভাঙা রাতের বাঁশিতে বেহাগের তান লাগল।

নিবিড় অমা-তিমির হতে

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে দোল। এক প্রান্তে বিরহ, আর প্রান্তে মিলন, স্পর্শ করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে–জীবন থেকে মরণে, মরণ থেকে জীবনে, অন্তর থেকে বাহিরে, আবার বাহির থেকে অন্তরে। এই দোলার তালে না মিলিয়ে চললেই রসভঙ্গ হয়। ও পাড়ার ওরা-যে দরজার আগল এঁটে বসেই রইল–হিসেবের খাতার উপর ঝুঁকে পড়েছে। একবার ওদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দোলের ডাক দাও।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্

কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ-যে ধ্যানস্তিমিতলোচন পুরোহিতের মতো আকাশের বেদীতে বসে উৎসবের মন্ত্র জপ করতে লাগল। ওকে দেখাচ্ছে যেন জ্যোৎস্নাসমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায় ফেনপুঞ্জের মতো–কিন্তু সে ঢেউ-যে চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ। এ দিকে আজ বিশ্বের বিচলিত চিত্ত দক্ষিণের হাওয়ায় ভেসে পড়েছে, চঞ্চলের দল মেতেছে বনের শাখায়, পাখিরা ডানায়–আর ঐ কি একা অবিচলিত হয়ে থাকবে নিবাতনিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্? নিজে মাতবে না আর বিশ্বকে মাতাবে, সে কেমন হল? এর একটা যা-হয় জবাব দিয়ে দাও।

কে দেবে চাঁদ তোমার দোলা[১]

আজ সব ভীরুদের ভয় ভাঙানো চাই। ঐ মাধবীর দ্বিধা-যে ঘোচে না। এ দিকে আকাশে আকাশে প্রগল্ভতা অথচ ওরা রইল সসংকোচে ছায়ার আড়ালে। ঐ অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। বেরিয়ে পড়বার হাওয়া বইল যে–বকুলগুলো রাশি রাশি ঝরতে ঝরতে বলছে 'যা হয় তা হোক গে', আমের মুকুল নির্ভয়ে বলে উঠছে 'দিয়ে ফেলব একেবারে শেষ পর্যন্ত।' যে পথিক আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্যেই পথে বেরিয়েছে তার কাছে আত্মনিবেদনের থালি উপুড় করে দিয়ে তবে তাকে আনতে পারবে নিজের আঙিনায়। কৃপণতা করে সময় বইয়ে দিলে তো চলবে না।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি

দেখতে দেখতে ভরসা বেড়ে উঠছে, তাকে পাব না তো কী। যখন দেখা দেয় না তখনো যে সাড়া দেয়। যে পথে চলে সেখানে-যে তার চলার রঙ লাগে। যে আড়াল থেকে তার ফাঁক দিয়ে আসে তার মালার গন্ধ। দুয়ারে অন্ধকারে যদি-বা চুপচাপ থাকে, আঙিনায় হাওয়াতে চলে কানাকানি। পড়তে পারি নে সব অক্ষর, কিন্তু চিঠিখানা মনের ঠিকানায় এসে পৌঁছয়। লুকিয়েই ও ধরা দেবে এমনিতরো ওর ভাবখানা।

BANGLADARSHAN.COM

সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া[১]

এইবারে বেড়া ভাঙল, দুর্বার বেগে। অন্ধকারের গুহায় অগোচরে জমে উঠেছিল বন্যার উপক্রমণিকা, হঠাৎ ঝর্না ছুটে বেরোল, পাথর গেল ভেঙে, বাধা গেল ভেসে। চরম যখন আসেন তখন এক-পা এক-পা পথ গুনে গুনে আসেন না। একেবারে বজ্রে-শান-দেওয়া বিদ্যুতের মতো, পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের বক্ষ এক আঘাতে বিদীর্ণ করে আসেন।

হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে,
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।
তোমার মোহন এল সোহন বেশে,
কুয়াশাভার গেল ভেসে,
এল তোমার সাধনধন উদার আশ্বাসে।

অরণ্যে তোর সুর ছিল না, বাতাস হিমে ভরা।
জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কানন, পুষ্পবিহীন ধরা।
এবার জাগ্রে হতাশ, আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
বুঝি এল তোমার পথের সাথি উতল উচ্ছ্বাসে।

BANGLADARSHAN.COM

উৎসবের সোনার কাঠি তোমাকে ছুঁয়েছে, চোখ খুলছে; এইবার সময় হল চার দিক দেখে নেবার। আজ দেখতে পাবে ঐ, শিশু হয়ে এসেছে চির নবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। তার দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ঐ সূর্যের আলো, সেও ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। তার দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ঐ সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। ঐ তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মর্মরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

ওরা অকারণে চঞ্চল

আবার একবার চেয়ে দেখো—অবজ্ঞায় চোখ ঝাপসা হয়ে থাকে, আজ সেই কুয়াশা যদি কেটে যায় তবে যাকে তুচ্ছ বলে দিনে দিনে এড়িয়ে গেছ তাকে দেখে নাও তার আপন মহিমায়। ঐ দেখা ঐ বনফুল, মহাপথিকের পথের ধারে ও ফোটে, তাঁর পায়ের করুণ স্পর্শে সুন্দর হয়ে ওঠে ওর প্রণতি। সূর্যের আলো ওকে আপন বলে চেনে; দখিন হাওয়া ওকে শুধিয়ে যায় ‘কেমন আছ।’ তোমার গানে আজ ওকে গৌরব দিক। এরা যেন কুরুরাজের সভায় শূদ্রার সন্তান বিদুরের মতো, আসন বটে নীচে, কিন্তু সম্মান স্বয়ং ভীষ্মের চেয়ে কম নয়।

আজ দখিন বাতাসে

কাব্যলোকের আদরিণী সহকারমঞ্জরীকে আর চিনিয়ে দিতে হবে না। সে আপনাকে তো লুকোতে জানে না। আকাশের হৃদয় সে অধিকার করেছে, মৌমাছির দল বন্দনা করে তার কাছ থেকে অজস্র দক্ষিণা নিয়ে যাচ্ছে।

সকলের আগেই উৎসবের সদাব্রত ও শুরু করে দিয়েছিল, সকলের শেষ পর্যন্ত ওর আমন্ত্রণ রইল খোলা। কোকিল ওর গুণগান দিনে রাতে আর শেষ করতে পারছে না—তোমরাও তান লাগাও।

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পৌঁছিয়ে দিলে। তারই সঙ্গে এনে দিলে অসীম সাগরের বাণী। দুর্গম উঠল সেই পথিকের মধ্যে গান গেয়ে। কিন্তু আনন্দ করতে করতেই চোখে জল আসে-যে। ভুলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়। পথিককে ঘরে আটক করে না। বাঁধন ছিঁড়ে নিজেও বেরিয়ে না পড়লে ওর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঠেকাবে কী করে? আমার ঘর-যে ওর যাওয়া-আসার পথের মাঝখানে; দেখা দেয় যদি-বা, তার পরেই সে-দেখা আবার কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার করুণ রঙিন পথ

তবু ওকে ক্ষণকালের বাঁধন পরিয়ে দিতে হবে। টুকরো টুকরো সুখের হার গাঁথব—পরাব ওকে মাধুর্যের মুক্তোগুলি। ফাল্গুনের ভরা সাজি থেকে যা-কিছু ঝরে ঝরে পড়ছে কুড়িয়ে নেব, বনের মর্মর, বকুলের গন্ধ, পলাশের রক্তিমা—আমার বাণীর সূত্রে সব গেঁথে বেঁধে দেব তার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার-দেওয়া ভূষণ প'রেই সে আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি, আমার দানের ভূষণ হয়ত থাকবে ওর দক্ষিণ হাতে।

BANGLADARSHAN.COM

ফাগুনের নবীন আনন্দে

॥দ্বিতীয় পর্ব॥

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে
তব নন্দনবন-অঙ্গন-দ্বারে, মনোমোহন বন্ধু,
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে॥

বিদায়দিনের প্রথম হাওয়াটা এবার উৎসবের মধ্যে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠল। এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো বকুলবনের সম্বল অজস্র, এখনো আম্রমঞ্জরীর নিমন্ত্রণে মৌমাছিদের আনাগোনা, কিন্তু তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, পথের একতারায় এবার সুর বাঁধা হচ্ছে। দূর দিগন্তের নীলিমায় দেখা যায় অশ্রুর আভাস—অবসানের গোধূলিছায়া নামছে।

BANGLADARSHAN.COM

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন

হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটির দিন এল। তার প্রণাম তুমি নাও। যে গানগুলি এতদিন গ্রহণ করেছ সেই তার আপন গানের বন্ধনেই সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে—তোমার উৎসবলীলায় সে চিরদিন রয়ে গেল তোমার সাথের সাথি। তোমাকে সে তার সুরের রাখী পরিয়েছে—তার চিরপরিচয় তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শস্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক

ওর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না বুঝি, এ দিকে বসন্তর পালা তো সাঙ্গ হয়ে এল। ওর মল্লিকাবনে এখনি তো পাপড়িগুলি সব পড়বে ঝরে—তখন বাণী পাবে কোথায়। ত্বরা কর্ গো, ত্বরা কর্। বাতাস তপ্ত হয়ে এল, এই বেলা রিক্ত হবার আগে তোর শেষ অঞ্জলি পূর্ণ করে দে; তার পরে আছে করুণ ধূলি, তার আঁচলে সব ঝরা ফুলের বিরাম।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি

সুন্দরের বীণার তারে কোমল গান্ধারে মীড় লেগেছে। আকাশের দীর্ঘনিশ্বাস বনে বনে হায় হায় করে উঠল, পাতা পড়ছে ঝরে ঝরে। বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগুলি একদিন শাখায় শাখায় আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, তারাই আজ যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিলে; বললে, তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর হোক।

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে

মন থাকে সুপ্ত, তখনো দ্বার থাকে খোলা, সেইখান দিয়ে কার আনাগোনা হয়; উত্তরীয়ের গন্ধ আসে ঘরের মধ্যে, ভুঁইচাঁপা ফুলের ছিন্ন পাপড়িগুলি লুটিয়ে থাকে তার যাওয়ার পথে; তার বীণা থেকে বসন্তবাহারের রেশটুকু কুড়িয়ে নেয় মধুকরগুঞ্জরিত দক্ষিণের হাওয়া; কিন্তু জানতে পাই নে, সে এসেছিল। জেগে উঠে দেখি তার আকাশপারের মালা সে পরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন দিলে পরায়ে

বনবন্ধুর যাবার সময় হল, কিন্তু হে বনস্পতি শাল, অবসানের দিন থেকে তুমি অবসাদ ঘুচিয়ে দিলে। উৎসবের শেষ বেলাকে তোমার অক্লান্ত মঞ্জরী ঐশ্বর্যে দিল ভরিয়ে। নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। সেই ধ্বনি আজ আকাশকে পূর্ণ করল, বিষাদের ম্লানতা দূর করে দিলে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমিই শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে ‘পুনর্দর্শনায়।’ তোমার আনন্দের সাহস কঠোর বিচ্ছেদের সমুখে দাঁড়িয়ে।

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল

দূরের ডাক এসেছে। পথিক, তোমাকে ফেরাবে কে। তোমার আসা আর তোমার যাওয়াকে আজ এক করে দেখাও। যে পথ তোমাকে নিয়ে আসে সেই পথই তোমাকে নিয়ে যায়, আবার সেই পথই ফিরিয়ে আনে। হে চিরনবীন, এই বঙ্কিম পথেই চিরদিন তোমার রথযাত্রা; যখন পিছে ফিরে চলে যাও সেই চলে যাওয়ার ভঙ্গিটি আবার এসে মেলে সামনের দিকে ফিরে আসায়–শেষ পর্যন্ত দেখতে পাইনে, হায় হায় করি।

BANGLADARSHAN.COM

এখন আমার সময় হল[১]

বিদায়বেলার অঞ্জলি যা শূন্য করে দেয় তা পূর্ণ হয় কোন্ খানে সেই কথাটা শোনা যাক।

এ বেলা ডাক পড়েছে কোন্ খানে[১]

আসন্ন বিরহের ভিতর দিয়ে শেষ বারের মতো দেওয়া-নেওয়া হয়ে যাক। তুমি দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, তোমার উত্তরীয়ের সুগন্ধ, তোমার বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও এই অন্তরের বেদনা আমার নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও

খেলা-শুরুও খেলা, খেলা-ভাঙাও খেলা। খেলার আরম্ভে হল বাঁধন, খেলার শেষে হল বাঁধন খোলা। মরণে বাঁচনে হাতে হাতে ধরে এই খেলার নাচন। এই খেলায় পুরোপুরি যোগ দাও–শুরুর সঙ্গে শেষের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিয়ে জয়ধ্বনি করে চলে যাও।

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়[১]

পথিক চলে গেল সুদূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে। এমনি করে কাছের বন্ধনকে বারে বারে সে আলগা করে দেয়। একটা কোন্ অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ বুকের ভিতর রেখে দিয়ে যায়–জানলায় বসে দেখতে পাই, তার পথ মিলিয়ে গেছে বনরাজিনীলা দিগন্তরেখার ওপারে। বিচ্ছেদের ডাক শুনতে পাই কোন্ নীলিম কুহেলিকার প্রান্ত থেকে–উদাস হয়ে যায় মন–কিন্তু সেই বিচ্ছেদের বাঁশিতে মিলনেরই সুর তো বাজে করুণ সাহানায়।

বাজে করুণ সুরে, হায় দূরে

এই খেলা-ভাঙার খেলা বীরের খেলা। শেষ পর্যন্ত যে ভঙ্গ দিল না তারই জয়। বাঁধন ছিঁড়ে যে চলে যেতে পারল, পথিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল পথে, তারই জন্যে জয়ের মালা। পিছনে ফিরে ভাঙা খেলনার টুকরো কুড়োতে গেল যে কৃপণ তার খেলা পুরা হল না–খেলা তাকে মুক্তি দিল না, খেলা তাকে বেঁধে রাখলে। এবার তবে ধুলোর সঞ্চয় চুকিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে বেরিয়ে পড়ো।

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা

এবার প্রলয়ের মধ্যে পূর্ণ হোক লীলা, শমে এসে সব তান মিলুক, শান্তি হোক, মুক্তি হোক্।

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥